ইউনিট ১৫
জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান
Physics to Save Life

এক সময় বলা হতো বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। এই প্রবাদটি এখন আর যৌক্তিকভাবে বলা যায় না। বিজ্ঞান আমাদের বেগকে অনেক বাড়িয়েছে। আমাদেরকে অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে ঠিক তেমনি পদার্থবিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা জীবনের খুব কঠিন তথা রোগ ব্যধি জরাকে জয় করে মুমূর্ষ রোগীর মুখে হাসি ফোটাতে পারছি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের নীতি ও তত্ত্ব ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় এবং রোগ নিরাময়ে যে পদার্থবিজ্ঞান ভূমিকা রেখে চলেছে তাতে আর্তমানবতার সেবায় পদার্থবিজ্ঞানীদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকছে। তাই বলা যায় পদার্থবিজ্ঞান বৃদ্ধি করেছে বেগ, করেছে সবাইকে কাছাকাছি, তেমনি মূল্যবোধে উজ্জীপিত ও আবেগপ্রবণ করেছে মানব জাতিকে।

পাঠ ১৫.১. জীবপদার্থবিজ্ঞান (Bio-Physics)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

১. জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. জীবপদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. জীবপদার্থবিজ্ঞানে জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৫.১.১ জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি (Foundation of Bio-Physics)

জীবপদার্থবিজ্ঞান বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি সমন্বিত বিষয়। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব, নীতি ও নিয়ম ব্যবহার করে জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করা হয়। এটি প্রধানত পদার্থবিজ্ঞান,রসায়ন,গণিত,জীববিজ্ঞান এবং প্রকৌশল শাখার সমন্বয়ে সৃষ্ট বিজ্ঞানের একটি শাখা। জীববিজ্ঞান জীবজগৎ নিয়ে চর্চা করে এবং অধ্যয়ন করে। কীভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী খাদ্য আহরণ করে, যোগাযোগ রক্ষা করে, পরিবেশ সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে এ বিষয়গুলো জীববিজ্ঞানে বর্ণনা করা হয়। অন্যদিকে প্রকৃতি যে সব গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে সেগুলো হলো পদার্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। দীর্ঘদিন একটি ধারণা বিজ্ঞানীরা পোষণ করে এসেছেন যে জীবজগতের নিয়ম ও ভৌতজগতের নিয়ম আলাদা। কিন্তু ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির ভিতর দিয়ে এই দুই বিজ্ঞানের মধ্যে গভীর মিল পাওয়া যায়। প্রথমে পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের দুটি ভিন্ন বিষয় হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে এই দুই বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে মনে করা হতো প্রাণি জগত ভিন্ন এক নিয়ম চলে এবং জড় পদার্থের ক্ষেত্রে শুধু ভৌতবিজ্ঞানের নিয়মগুলো প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা এখন জানি প্রাণি দেহকে অনেক দিক থেকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং প্রাণিদেহের অনেক আচরণকে ভৌত নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বস্তুত পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো সার্বজনীন। ফলে শুধু জড় জগত নয়, প্রাণি জগতকেও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এটিই জীব পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি।

১৫.১.২ জীবপদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ (Development of Bio-Physics)

জীবপদার্থবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি শাখা। জীবপদার্থবিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ হলো কীভাবে জীবনের নানা জটিলতাকে ভৌতবিজ্ঞানের নিয়মের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়। রসায়ন, প্রকৌশলবিদ্যা, গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে

জীবনের নানাবিধ রহস্য অনুসন্ধান ও বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর গভীরে প্রবেশ করার শক্তিশালী মাধ্যম হলো জীবপদার্থবিজ্ঞান। জীবপদার্থবিজ্ঞান হলো জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ।

মানুষ চিরন্তরভাবে নতুন জ্ঞানের অন্বেষণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। বিশাল মহাশূন্যের রহস্য উন্মোচনে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। একইভাবে মানবদেহের বিভিন্ন অংশের রহস্য উন্মোচনে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। হৃৎযন্ত্র কীভাবে রক্ত সঞ্চালন করে, মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে, পেশি কেন সংকুচিত হয়, উদ্ভিদ কীভাবে সালোকসংশ্লেষনে আলো ব্যবহার করে, জীন কীভাবে বংশগতি রক্ষা করে, ডিএনএ কীভাবে কাজ করে, প্রোটিন কীভাবে কাজ করে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের কোন একটি শাখার মধ্যে এদের উত্তর পাওয়া যায় না। এতে অন্য শাখার সাহায্য নিতে হয়। এতে তৈরি হয় শাখাসমূহের মধ্যে সম্পর্ক এবং উদ্ভব হয় নতুন বিষয়ের। জীবপদার্থবিজ্ঞান তারই একটি প্রকাশ।

জীবপদার্থবিজ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা খুব পুরাতন না হলেও এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা কাজ করে আসছেন বিজ্ঞানচর্চার আদি লগ্ন থেকে। হেরাক্লিটাসকে (Heraclitis))প্রথম জীবপদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তিনি জীবন প্রক্রিয়ায় বলবিদ্যার তত্ত্ব প্রদান করেন। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ইপিকিউরাস (Epicurus) দেখান যে, জীবজগৎ জড়জগতের নিয়মসমূহ সমভাবে অনুসরন করে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci)ষোড়শ শতাব্দীতে পাখী উড্ডয়নের যান্ত্রিক নীতি প্রদান করেন। বোরিলিওকে (Borelli) জীববলবিদ্যার জনক বলা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীদে তিনি জীব ও যন্ত্রের মধ্যে গাণিতিক সর্ম্পক দেখান। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে গ্যালভানী (Galvani) ইলেক্টোড্র হিসাবে ব্যাঙের পা ব্যবহার করেন এবং সর্বপ্রথম ব্যাটারি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে জীবপদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। মানব চোখের আলোকীয় কার্যক্রম, শ্রবণের তত্ত্ব, ব্রাউনিয়ান গতি, অভিস্রবন প্রক্রিয়া, শব্দ তরঙ্গের ব্যবহার, এক্সরে এর আবিষ্কার, ডিএনএ কাঠামো বিশ্লেষণ, প্রোটিন বিশ্লেষণ ইত্যাদি ধারণা সুষ্ঠুরূপে উপস্থাপনার জন্য জীবপদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে নিতে হয়।

১৫.১.৩ জীবপদার্থবিজ্ঞানে জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান (Contribution of Sir Jagadish Chandra Bose in Bio-physics)

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ নভেম্বর ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবান চন্দ্র বসু ফরিদপুর জেলার ডেপুটি ম্যাজিট্রেট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বসু পরিবারের আদি নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরে। জগদীশচন্দ্র বসু ফরিদপুরের গ্রামীন বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় লেখাপড়া শুরু করেন। পরে তিনি কোলকাতার হেয়ার স্কুল এন্ড জেভিয়ার স্কুল এন্ড কলেজে লেখা পড়া করেন। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান। তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স পড়াশুনা করেন।

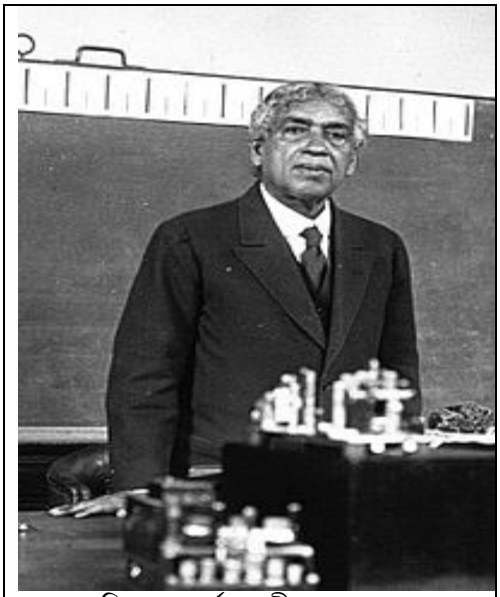
চিত্র: আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

গবেষণা কর্ম

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপনা এবং গবেষণা শুরু করেন। জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম বিনা তারে দুরবর্তী স্থানে সংকেত পাঠানো বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং সফল হন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বারের মত দূরবর্তী স্থানে বিনা তারে রেডিও তরঙ্গ প্রেরণ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনিই প্রথম তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার (৫মিলিমিটার) পর্যায়ে পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। জগদীশচন্দ্র বসুই সর্বপ্রথম রেডিও সংকেত শনাক্ত করার কাজে অর্ধপরিবাহি জাংশন ব্যবহার করেন। এই আবিষ্কারকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর আবিষ্কারকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। জীবপদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি উদ্ভিদের শারীরিতত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ। তিনি উদ্ভিদের উদ্দীপকে সাড়া দেওয়ার কারণ ও প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখান যে বিভিন্ন উদ্দীপনায় উদ্ভিদেও সাড়া দেওয়ার প্রকৃতি রাসায়নিক নয়. বৈদ্যুতিক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের

একটি হচ্ছে 'Response in the living and non-living'। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে উদ্ভিদ-শরীরিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য কলকাতায় বসু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু পরলোকে গমন করেন।

সার-সংক্ষেপঃ

জীবপদার্থবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি সমন্বিত বিষয়। বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব, নীতি ও নিয়ম ব্যবহার করে জীবপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। জীবপদার্থবিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসুর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তিনি উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার করেন। তিনি উদ্ভিদের উদ্দীপকে সাড়া দেওয়ার কারণ ও প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন।

পাঠত্তোর মূল্যায়নঃ ১৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কার?

ক. বসু মন্দির
খ. ক্রেস্কোগ্রাফ
গ. তরঙ্গদৈর্ঘ্য
ঘ. জীবপদার্থবিজ্ঞান

২. জীবপদার্থবিজ্ঞান-

i. ভৌত জগতের নিয়মের সাথে জীব জগতের সমন্বয় করে।
ii. রেডিও তরঙ্গ চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যবহার করে।
iii. ভৌত বিজ্ঞানের নিয়মাবলি কৃষি বিজ্ঞান ব্যবহার করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১৫.২ মানবদেহ এবং রোগ নির্ণয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অবদান
(Human body and contribution of physics in diagnosis of disease)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

১ মানবদেহ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে পরিচালিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. এক্সরে যন্ত্রের মূলনীতি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. সিটিস্ক্যানের মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. এমআরআই এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫. আল্ট্রাসনোগ্রাফি এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৬. এন্ডোস্কোপি এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন

১৫.২.১ মানবদেহ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম (Physics rules in humanbody)

মানবদেহ মাথা থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত কতকগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। এই অঙ্গগুলো মানবদেহেকে সচল রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট কতকগুলো কার্যক্রম পরিচালনা করে। একটি অঙ্গের কার্যক্রম অন্য অংশের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত এবং নির্ভরশীল। অঙ্গগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মস্তিষ্ক, চোখ, কান, নাক, দাঁত, গলা, কণ্ঠ নালী, শ্বাসনালী, হৃৎযন্ত্র, ফুসফুস, বৃক্ক, গলব্ল্যাডার, যকৃত এবং কঙ্কাল তন্ত্র ইত্যাদি। মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ আলাদা আলাদা কাজে নিয়োজিত। মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ একে অন্যের সাথে আন্তসম্পর্কিত, প্রত্যেকটি অঙ্গ নিজস্ব গতিতে চলে, কিন্তু সবগুলো কাজই সুনির্দিষ্ট এবং এদের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই মানবদেহ প্রকৃতিসৃষ্ট সবচেয়ে জটিল একটি যন্ত্র যার রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানীরা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। মানবদেহের বর্ণিত এই অঙ্গগুলো অনেক ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে। রক্ত নালীর মাধ্যমে হৃদপিন্ড সম্পূর্ণ দেহে রক্ত সঞ্চালন করে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রক্ত চাপ বজায় রাখতে হয়। হৃৎপিন্ড একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্ত সঞ্চালন করে। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৭২বার সংকোচন ও সম্প্রসারিত হয়।

হৃৎপিন্ড প্রকৃত অর্থে একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্প, যা বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিজস্ব বৈদ্যুতিক সিগন্যাল দ্বারা সমগ্রদেহে রক্ত সঞ্চলন করতে সক্ষম। অপরদিকে, বৃক্ক একটি বিশেষ ছাঁকন যন্ত্র যা মানুষের শরীরের নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে থাকে। এরকম অসংখ্য ছোট বড় অঙ্গের কাজের সমন্বয়ের ফলে সম্পূর্ণ মানবদেহ সচল থাকে।

মানবদেহ একটি জৈবযন্ত্র স্বরূপ। যন্ত্র দ্বারা কাজ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। খাদ্য গ্রহণ ও শ্বসন প্রকিয়ার মাধ্যমে মানবদেহেও রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তি ও যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

মানবদেহ এবং এর অঙ্গসমূহ স্বতস্ফুর্ত এবং স্বাভাবিকভাবে আজীবন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। পরিবেশ দূষণ, খাদ্যে বিষক্রিয়া, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, সুস্থ জীবন যাপনের প্রণালী অনুসরণ না করা, সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা ইত্যাদি কারণে মানুষ বিভিন্ন বয়সে নানা ধরণের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান রোগব্যাধি নির্ণয় এবং নিরাময়ে কাজ করে যাচ্ছে। রোগব্যাধি নির্ণয় এবং নিরাময়ে পদার্থবিজ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞান শাস্ত্রকে নানাভাবে সহযোগিতা প্রদান করছে। নিচে এই অবদানের কিছু বর্ণনা করা হল।

১৫.২.২ এক্সরে যন্ত্রের মূলনীতি ও ও এর ব্যবহার
(Principle of X-ray machine and its application)

এক্সরে

এক্সরে হলো এক ধরনের তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ। এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম। এই রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10^{-10}m এর কাছাকাছি। ১৮৯৫ সালে রন্টজেন এক্সরে আবিস্কার করেন। এক্সরে রঞ্জনরশ্মি নামেও পরিচিত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক্সরের অবদান নিচে বর্ণনা করা হল।

১. স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল, ভেঙে যাওয়া হাড় ইত্যাদি এক্সরের সাহায্যে খুব সহজেই সনাক্ত করা যায়।
২. মুখমন্ডলীর যে কোনো ধরনের রোগ নির্ণয়ে এক্সরের ব্যবহার অনেক যেমন- দাঁতের গোড়ায় ঘা এবং ক্ষয় নির্ণয়ে এক্সরে ব্যবহৃত হয়।
৩. পেটের এক্সরের সাহায্যে অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করা যায়।
৪. এক্সরের সাহায্যে পিত্ত থলি ও কিডনির পাথরকে সনাক্ত করা যায়।
৫. বুকের এক্সরের সাহায্যে ফুসফুসের রোগ যেমন- যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়।
৬. চিকিৎসার কাজেও এক্সরে ব্যবহার করা যায়। এটি ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে। রেডিওথেরাপি প্রয়োগ করে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা যায়।

এক্সরের অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ সম্পাত যাতে রোগীর ক্ষতি করতে না পারে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এজন্য এক্সরে নেওয়ার সময় রোগীকে সীসা নির্মিত এপ্রোন দ্বারা যথাসম্ভব আচ্ছাদিত করতে হবে। অতি জরুরী না হলে গর্ভবতী মহিলাদের উদর এবং পেলভিক অঞ্চলের এক্সরে করা উচিত নয়। অন্য কোনো এক্সরে পরীক্ষা প্রয়োজন হলে সীসা নির্মিত এপ্রোন অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

১৫.২.৩ সিটিস্ক্যানের মূলনীতি ও এর ব্যবহার
(Principle of CT scan and its application)

সিটি স্ক্যান

সিটিস্ক্যান এর সম্প্রসারিত অর্থ হচ্ছে কম্পিউটেড টমোগ্রাফি স্ক্যান(Computed Tomography Scan)। এর সাহায্যে প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটি প্রতিবিম্ব তৈরির একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তুর কোনো ফালি বা অংশের দ্বিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয় সে প্রক্রিয়াকে টমোগ্রাফি বলে। সিটিস্ক্যান একটি বৃহৎ যন্ত্র। এ যন্ত্রে এক্সরে ব্যবহৃত হয়। এক্সরে যেখানে শরীরের অভ্যন্তরের কোনো ত্রিমাত্রিক অঙ্গের দ্বিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠন করে, সেখানে সিটি স্ক্যান যন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবিম্ব ত্রিমাত্রিক।

চিত্র ১৪.২ সিটিস্ক্যান

সিটিস্ক্যানের সাহায্যে শরীরের নরম টিস্যু, রক্তবাহী শিরা বা ধমনী, ফুসফুস, ব্রেণ ইত্যাদির ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া যায়। যকৃত, ফুসফুস এবং অগ্নাশয়ের ক্যান্সার সনাক্ত করার কাজে সিটিস্ক্যান ব্যবহৃত হয়। সিটিস্ক্যানের প্রতিবিম্ব চিকিৎসককে টিউমার সনাক্তকরণ, টিউমারের আকার, অবস্থান এবং টিউমারটি পাশ্ববর্তী অন্য টিস্যুকে কী পরিমাণ আক্রান্ত করেছে তা নির্ধারণেও সাহায্য করে। মাথার সিটিস্ক্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতরে কোনো ধরনের রক্তপাত, ধমনীর ফুলা এবং টিউমারের উপস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। সিটিস্ক্যানের দ্বারা রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা আছে কীনা তাও জানা যায়। সাধারণত গর্ভবতী মহিলাদের সিটি স্ক্যান পরীক্ষা করা হয় না। সিটিস্ক্যান পরীক্ষায় 'ডাই' ব্যবহৃত হরে এলার্জি জনিত বিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৫.২.৪ এমআরআই এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার (Principle of MRI and its applications)

এমআরআই

এমআরআই এর অর্থ হচ্ছে ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইম্যাজিং (Magnetic Resonance Imaging)। এমআরআই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের কোনো স্থানের বা অঙ্গের বিস্তৃত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। নিউক্লিয় চৌম্বক অনুনাদের ভৌত এবং রাসায়নিক নীতির উপর ভিত্তি করে এমআরআই যন্ত্র কাজ করে। এই নীতি ব্যবহার করে কোনো অণুর প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য জানা যায়।

চিত্র ১৪.৩ এমআরআই

এমআরআই একটি নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। এই যন্ত্রে এক্সরে বা অন্য কোনো ধরনের বিকিরণ ব্যবহার করা হয় না। শরীরের যে অংশের এমআরআই স্ক্যান করা হয় সেখান থেকে প্রাপ্ত সংকেতকে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে পরিবর্তিত করে সেই অংশের অত্যন্ত স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রতিবিম্ব শরীরের কোনো স্থানের এক একটি ফালির মতো কাজ করে। এভাবে অনেকগুলো প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়, যেগুলো শরীরের ঐ অংশের সকল বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলে।

পায়ের গোড়ালির মচকানো এবং পিঠের ব্যাথায় এমআরআই ব্যবহার করে জখমের বা আঘাতের তীব্রতা নিরূপণ করা হয়। ব্রেণ এবং মেরু রুজ্জুর বিস্তৃত প্রতিবিম্ব তৈরির জন্য এমআরআই হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

১৫.২.৫ আল্ট্রাসনোগ্রাফির মূলনীতি ও এর ব্যবহার (Principle of Ultrsonography and its applications)

আল্ট্রাসনোগ্রাফি

আল্ট্রাসনোগ্রাফি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল। উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ যখন শরীরের গভীরের কোনো অঙ্গ বা পেশি থেকে প্রতিফলিত হয় তখন প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে ঐ অঙ্গের অনুরূপ একটি প্রতিবিম্ব মনিটরের পর্দায় গঠন করা হয়।

চিত্র ১৪.১ আল্ট্রাসনোগ্রাফি

রোগ নির্ণয়ের জন্য যে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয় সেই শব্দের কম্পাঙ্ক 1-10 মেগাহার্টজ হয়ে থাকে। আট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে লক্ষ্য করা যায়। এর সাহায্যে ভ্রুণের আকার, পূর্নতা, ভ্রুণের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান জানা যায়। প্রসূতিবিদ্যায় এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য কৌশল। আল্ট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে পিত্তপাথর,জড়ায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক মাসের উপস্থিতিও শনাক্ত করা যায়। এক্সরের তুলনায় আল্ট্রাসনোগ্রাফি অধিকতর নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। তবুও আল্ট্রাসাউন্ড খুব সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

১৫.২.৬ এন্ডোস্কোপি এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার (Principle of Endoscopy and its applications)

এন্ডোসকোপি

এন্ডোসকোপি বলতে সাধারণভাবে কোনো কিছুর ভিতরে দেখাকে বুঝায়। কিন্তু এন্ডোসকপি বলতে আমরা বুঝি চিকিৎসাজনিত কারণে বা প্রয়োজনে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনো অঙ্গ বা গহ্বরকে বাহির থেকে পর্যবেক্ষণ। এন্ডোসকোপ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শরীরের ফাঁকা অঙ্গসমূহের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করে থাকি।

চিত্র ১৪.৪ এন্ডোস্কোপি

এন্ডোসকোপ যন্ত্রে দুটি নল থাকে, এদের একটির মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গে আলো প্রেরণ করা হয়। আলোক তন্তুর ভিতরের দেয়ালে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে উজ্জ্বল আলো রোগীর দেহ গহ্বরে প্রবেশ করে। এই আলো রোগাক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ অঙ্গকে আলোকিত করে। দ্বিতীয় আলোক তন্তু নলের ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিফলিত অংশ একইভাবে ফিরে আসে। প্রতিফলিত আলো অভিনেত্র লেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসকের চোখে প্রবেশ করে। ফলে চিকিৎসক পরীক্ষনীয় অঙ্গের অভ্যন্তরে কী ঘটছে বা হচ্ছে তা দেখতে পারেন।

এন্ডাসকোপির মাধ্যমে চিকিৎসকগণ শরীরের অভ্যন্তরে যে কোনো ধরণের অস্বস্তিবোধ,ক্ষত,প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষবৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন। নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা করার জন্য এন্ডোসকোপি ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো-

ক. ফুসফুস, বুকের কেন্দ্রীয় বিভাজন অংশ; খ. পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র বা কোলন; গ. স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ; ঘ. উদর এবং পেলভিস; ঙ. মূত্রথলির অভ্যন্তরভাগ; চ. নাসাগহ্বর এবং নাকের চারপাশের সাইনাসসমুহ; ছ. কান।

সার-সংক্ষেপঃ

মানবদেহের উল্লেখযোগ্য অঙ্গসমূহ যেমন মস্তিষ্ক, চোখ, কান, নাক, দাঁত, গলা, কণ্ঠ নালী, শ্বাসনালী, হৃৎযন্ত্র, ফুসফুস, বৃক্ক, গলব্ল্যাডার, যকৃত এবং কঙ্কালতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এগুলো পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে। মানব শরীরের রোগ ব্যাধি নির্ণয় ও নিরাময়ে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম, নীতি এবং সূত্র ব্যবহার করে অনেক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে এক্সরে সিটিস্ক্যান, এমআরআই, আল্ট্রাসানোগ্রাফি, এন্ডোসকোপি ইত্যাদি।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন : ১৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে ব্যবহার করা হয় কত কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ?

ক. 1-10 মেগাহার্টজ　　খ. 5-15 মেগাহার্টজ
গ. 10-20 মেগাহার্টজ　　ঘ. 15-25 মেগাহার্টজ

২. এন্ডোস্কোপি যন্ত্রে পদার্থবিজ্ঞানের কোন নীতি ব্যবহার করা হয়েছে?

ক. শব্দের প্রতিধ্বনি　　খ. আলোর প্রতিফলন
গ. আলোর পূর্ণপ্রতিফলন　　ঘ. আলোর প্রতিসরণ

৩. এক্সরে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান হচ্ছে-

ক. 10^{-9}m　　খ. 10^{-10}m
গ. 10^{-11}m　　ঘ. 10^{-12}m

পাঠ ১৫.৩ হৃদরোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

১. ইসিজি এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।
২. ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. ইটিটি এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।
৪. এনজিওগ্রাফি এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

১৫.৩.১ ইসিজি এবং এর ব্যবহার (ECG and its applications)

ইসিজি

ইসিজি শব্দের সম্প্রসারিত অর্থ হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram) । ইসিজি এর সাহায্যে নিয়মিতভাবে কোনো ব্যক্তির হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক এবং পেশিজনিত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ইসিজি এর সাহায্যে আমরা হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের হার এবং ছন্দময়তা পরিমাপ করতে পারি। এটি হৃৎপিন্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের পরোক্ষ প্রমাণ দেয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত তড়িৎদ্বার বা ইলেকট্রোডসমূহ হৃৎযন্ত্রের বিভিন্ন দিক থেকে আগত বৈদ্যুতিক সংকেতগুলোকে সনাক্ত করে।

চিত্র ১৪.৫ ইসিজি মেশিন

হৃৎপিন্ডের একটি সম্পূর্ণ ছবি পাবার জন্য দশটি ইলেকট্রোড ব্যবহার করে বারোটি বৈদ্যুতিক সংকেতকে সনাক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি হাতে এবং পায়ে একটি করে মোট চারটি এবং বাকী ছয়টি ইলেকট্রোড হৃৎপিন্ডের প্রাচীর বরাবর স্থাপন করা হয়

(চিত্র ১৪.৬)। প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড দ্বারা সংগৃহীত তড়িৎ সংকেতকে রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ড সমূহের মুদ্রিত রুপই হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।

সুস্থ মানুষের জন্য প্রত্যেক ইলেকট্রোড থেকে প্রাপ্ত তড়িৎ সংকেতের একটি স্বাভাবিক নকশা থাকে। যদি কোনো ব্যক্তির হৃৎযন্ত্রে কোনো ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করা যায় তখন ইলেকট্রোডসমূহ থেকে প্রাপ্ত নকশা স্বাভাবিক নকশা থেকে ভিন্নতর হবে।

সাধারণত কোনো রোগের বাহ্যিক লক্ষণ যেমন- বুকের ধরপড়ানি, অনিয়মিত ও দ্রুত হৃৎস্পন্দন, বুকে ব্যথা ইত্যাদির কারণ নির্ণয় করার জন্য ইসিজি পরীক্ষা করতে হয়। এছাড়াও নিয়মিত পরীক্ষার অংশ হিসেবে যেমন অপারেশনের পূর্বে ইসিজির সাহায্য নেওয়া হয়।

হৃৎপিন্ডের যে সকল অস্বাভাবিক প্রকৃতি ইসিজির মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় এগুলো হলো-

১. হৃৎপিন্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন যেমন- হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের হার বেশি বা কম বা অনিয়মিত হলে;
২. হার্ট অ্যাটাক যা সম্প্রতি বা কিছুদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছে;
৩. সম্প্রসারিত হৃৎপিন্ড অর্থাৎ হৃৎপিন্ডের আকার বড় হয়ে যাওয়া।

১৫.৩.২ ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং এর ব্যবহার (Echocardiography and its applications)

চিত্র: ইকোকার্ডিওগ্রাফি

ইকোকার্ডিওগ্রাফি যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎযন্ত্রের কার্যক্রমের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন করা যায়। শব্দের প্রতিফলনের নীতির ওপর ভিত্তি করে ইকোকার্ডিওগ্রাফি যন্ত্রের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। শব্দতরঙ্গ হচ্ছে যান্ত্রিক তরঙ্গ যা মাধ্যমের সংকোচন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। আল্ট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্রে শব্দের প্রতিধ্বনিকে ব্যবহার করা হয়। আল্ট্রাসনোগ্রাফি উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল। উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ হৃৎপিন্ডের যখন শরীরের গভীরের কোনো অঙ্গ বা পেশি থেকে প্রতিফলিত হয় তখন প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে ঐ অঙ্গের অনুরূপ একটি প্রতিবিম্ব মনিটরের পর্দায় গঠন করা হয়। এই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত তরঙ্গের দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব মনিটরে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে 2-10MHz

কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। টিস্যুর মধ্যে শব্দ তরঙ্গ সাধারণত $1540ms^{-1}$এবং রক্তের মধ্যে $1570ms^{-1}$ বেগে সঞ্চালিত হয়। আপতিত শব্দ তরঙ্গ হৃৎযন্ত্রের টিস্যুর সংকোচন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে হৃৎযন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালিত হতে থাকে। যত বেশি কমাঙ্কের তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়, প্রতিফলিত বিম্বের স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা তত বেশি হয়।

১৫.৩.৩ ইটিটি এবং এর ব্যবহার (ETT and its applications)

ইটিটি

ইটিটির সম্প্রসারিত অর্থ হচ্ছে এক্সেরসাইজ টলারেসন্স টেস্ট (Exercise Tolerence Test)। উদ্দীপিত হৃৎযন্ত্রের একটি পরীক্ষা হলো ইটিটি। ব্যায়াম বা অনুশীলন চলাকালীন হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক সক্রিয়তা বা কার্যকলাপ (স্পন্দনের হার, ছন্দময়তা) ইটিটি পরীক্ষার মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়। এটি আসলে অনুশীলনরত অবস্থায় রোগীর ইসিজি পরীক্ষা। করোনারী আর্টারী রোগের রোগ নিরুপণের জন্য এ পরীক্ষাটি খুবই উপযোগী। এই পরীক্ষার সময় হৃদযন্ত্রের উপর অনুশীলনের অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা হয়। পরীক্ষাটির মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের করোনারী ধমনীতে সৃষ্ট আংশিক অবরুদ্ধ অবস্থা

(Partial Blockage) সনাক্ত করা হয়ে থাকে। সাধারণত বিশ্রামে থাকা অবস্থায় রোগীর দেহে এ ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা সনাক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

চিত্র ১৪.৬ ইটিটি মেশিন

পরীক্ষার সময় রোগীকে একটি স্থির বাইসাইকেল চালাতে বলা হয় বা একটি ট্রেডমিল যন্ত্রে অনবরত হাঁটার নির্দেশনা দেওয়া হয়। অনুশীলন চলা অবস্থায় চিকিৎসক রোগীর ইসিজি রেকর্ড করেন। পরীক্ষার সময় চাকার ঘূর্ণন দ্রুতি এবং তলের ঢাল উপযোজনের মাধ্যমে যান্ত্রিক পীড়নের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি করা হয়। ইটিটি পরীক্ষার মাধ্যমে অনুশীলনের সময় রোগীর হৃৎযন্ত্রে যে সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয় চিকিৎসক সেগুলো সনাক্ত করতে সক্ষম হন।

১৫.৩.৪ এনজিওগ্রাফি এবং এর ব্যবহার (Engiography and its applications)

এনজিওগ্রাফি

এনজিওগ্রাফি হলো এমন একটি প্রতিবিম্ব তৈরির পরীক্ষা যেখানে শরীরের রক্তনালিকাসমূহ দেখার জন্য এক্সরে ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তবাহী শিরা বা ধমনীগুলো সরু, ব্লক ও প্রসারিত হয়েছে কী না তা নির্ণয় করা যায়। রক্তনালিতে ব্লক এবং রক্তনালি সরু এবং অপ্রসস্থ হলে শরীরে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। এনজিওগ্রাম করার সময় চিকিৎসক রোগীর দেহে একটি তরল পদার্থ একটি সরু ও নমনীয় নলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন। তরল পদার্থটিকে 'ডাই' এবং নলটিকে ক্যাথেটার বলে। এই ডাই ব্যবহারের ফলে রক্তবাহী নালিকাগুলো এক্সরের সাহায্যে দৃশ্যমান হয়। এই ডাই পরে কিডনী এবং মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট প্রবেশ বিন্দুর মধ্য দিয়ে ক্যাথেটারটিকে নির্দিষ্ট ধমনী বা শিরার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। প্রবেশ বিন্দুটি শরীরের যে কোনো স্থানের রক্তনালিতে হতে পারে। ব্যবহৃত ডাইটিকে কখনো কখনো বৈসাদৃশ্য বা Contrast হিসেবে অভিহিত করা হয়।

চিত্র ১৪.৭ এনজিওগ্রাম

সাধারণত যে সকল কারণে চিকিৎসকগণ এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেন, এগুলো হলো-

ক. হৃৎপিন্ডের বাহিরে ধমনীতে ব্লকেজ হলে;

খ. ধমনী প্রসারিত হলে;

গ. কিডনির ধমনীর অবস্থা বুঝার জন্য;

ঘ. শিরার যে কোনো সমস্যা হলে।

কখনো কখনো চিকিসকগণ এনজিওগ্রাম করার সময় একই সময়ে সার্জারী ছাড়াই রক্তনালির ব্লকের চিকিৎসা করে থাকেন। যে কৌশলে বা প্রক্রিয়ায় এনজিওগ্রাম করার সময় ধমনীর ব্লক মুক্ত করার হয় তাকে এনজিওপ্লাষ্টি বলে।

সার-সংক্ষেপঃ

পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম ব্যবহার করে হৃদরোগ নির্ণয় করা যায়। হৃদরোগ নির্ণয়ে যে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করে কাজ করে। ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইটিটি এবং এনজিওগ্রাফি হৃদরোগ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পাঠত্তোর মূল্যায়নঃ ১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক?

ক. ইসিজি হচ্ছে হৃদরোগ নির্ণয়ের একটি অপ্রত্যক্ষ পরীক্ষা।

খ. ইটিটির সাহায্যে ধমনীর ব্লক চিহ্নিত করা যায়।

গ.ইসিজি পরীক্ষায় তাড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়।

ঘ. ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে শব্দের প্রতিসরণ সূত্র ব্যবহার করা হয়।

২. হৃদরোগ নির্ণয়ের মেশিন-

i. ইসিজির সাহায্যে তড়িৎ সংকেত মানবদেহে প্রেরণ করা হয়।

ii. ইটিটির মাধ্যমে হৃদযন্ত্রকে পরিপূর্ণ সচল করে তড়িৎ সংকেত প্রেরণ করা হয়।

iii. এনজিওগ্রাফির সাহায্যে হৃদরোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এক সাথে করা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১৫.৪ রেডিওথেরাপি ও আইসোটোপের ব্যবহার (Use of Radiotherapy and Isotope)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

১. চিকিৎসা ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
২. চিকিৎসা ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা এবং এর প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৫.৪.১ চিকিৎসা ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপির ভূমিকা (Role of Radiotherapy in medical treatment)

রেডিওথেরাপি

রেডিওথেরাপি শব্দটি ইংরেজী 'Radiation Therapy' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ যেমন- ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক প্রকৃতি, রক্তের কিছু ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত রেডিওথেরাপি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এক্সরে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। এটি টিউমার কোষের অভ্যন্তরস্থ ডিএনএ (DNA)-কে ধ্বংসের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলে।

রেডিওথেরাপি দু'ধরনের: (১) বাহ্যিক রেডিওথেরাপি (২) অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপি।

বাহ্যিক রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে শরীরের বাহির থেকে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এক্সরে, কোবাল্ট বিকিরণ, ইলেকট্রন বা প্রোটন বীম ব্যবহার করা হয়। শরীরের যে স্থানে টিউমারটি অবস্থিত, সেই দিকে তাক করে বীমটি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি এবং বিভাজন ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় অল্প সংখ্যক সুস্থ কোষও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবুও আমাদের উদ্দেশ্য হলো যত কম সংখ্যক সুস্থ কোষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে যত বেশি সংখ্যক ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা। ক্ষতিগ্রস্থ অধিকাংশ সুস্থ কোষ নিজে থেকে এই ক্ষতি মেরামত করে ফেলে।

চিত্র ১৪.৮ : রেডিওথেরাপি যন্ত্র

অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে রোগীকে শরীরের ভেতর থেকে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় রোগী তেজস্ক্রিয় তরল পদার্থ পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে। অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগীর দেহে তেজস্ক্রিয় তরল পদার্থ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। রক্তের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এ তরল পদার্থে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস, হাড়ের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়াম এবং থাইরয়েড ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করা হয়।

১৫.৪.২ চিকিৎসা ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার (Role of Isotope in medical treatment)

আইসোটোপ এবং এর ব্যবহার

আইসোটোপগুলো হলো একটি নির্দিষ্ট মৌলের রূপভেদ। বিভিন্ন ভরসংখ্যা বিশিষ্ট একই মৌলের পরমাণুকে ঐ মৌলের আইসোটোপ বলে। অর্থাৎ কোনো মৌলের আইসোটোপ সমূহে প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু নিউট্রানের সংখ্যা বিভিন্ন হয়। কোনো পরমাণূর নিউক্লীয়াসে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যা মৌলটিকে অনন্য রূপে সনাক্ত করে। কিন্তু নীতিগতভাবে একটি মৌলের যে কোনো সংখ্যক নিউট্রন থাকতে পারে। মৌলের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যার সমষ্টি হলো এর ভরসংখ্যা। এ কারণেই কোনো মৌলের প্রত্যেকটি আইসোটোপের ভরসংখ্যা বিভিন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে কার্বনের কথা বলা যেতে পারে। কার্বনের তিনটি আইসোটোপ $^{12}_{6}C$, $^{13}_{6}C$ এবং $^{14}_{6}C$, যাদের ভরসংখ্যা যথাক্রমে 12,13,14। কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা 6, অর্থাৎ প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুতে ছয়টি প্রোটন আছে, যার ফলে কার্বনের আইসোটোপগুলোতে যথাক্রমে 6, 7 এবং 8 টি নিউট্রন রয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে 'পরমাণু চিকিৎসায়' তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রধানত রোগ নির্ণয়ের এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

রোগীর শরীরে কোনো স্থানে বা অঙ্গে ক্ষতিকর ক্যান্সার টিউমারের উপস্থিতি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে শনাক্ত করা যায়। কোবাল্ট-60 (^{60}Co) আইসোটোপ থেকে নির্গত শক্তিশালী গামা রশ্মি ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কোবাল্ট- 60 থেকে নির্গত গামা রশ্মির সাহায্যে অপারেশনের যন্ত্রপতি রোগ জীবাণুমুক্ত করা হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থি বা গলগ্র্যান্ডের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জনিত রোগের চিকিৎসায় আয়োডিন- 131 (^{131}I) ব্যবহৃত হয়। টেকনিশিয়াম- 99m রোগ নির্ণয়ের জন্য পরমাণু চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এটির সাহায্যে ব্রেণ, লিভার, প্লীহা এবং হাড়ের ইমেজিং বা স্ক্যানিং সম্পন্ন করা হয়। রক্তের শ্বেত কণিকার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে রক্তাল্পতা (blood-Leucaemia) রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় ফসফরাস- 32(^{32}p) এর ফসফেট ব্যবহৃত হয়। পরমাণু চিকিৎসায় রোগ নির্ণয়ের জন্য শিরার মধ্য দিয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়। রোগীর কোন্ অঙ্গের পরীক্ষা করা হবে তার উপর নির্ভর করেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্বাচন করা হয়। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে, খাদ্য সংরক্ষণে, কীটপতঙ্গ দমনে এবং শিল্পক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

১৫.৪.৩ আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা (Health hazard created by using modern technology and instruments)

আমরা আগেই জেনেছি যে, পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের জ্ঞানের সমন্বয়ে জীবপদার্থবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছে। জীবপদার্থবিজ্ঞান মানব কল্যাণে যুগান্তকারি অবদান রেখে চলেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে জীবপদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহার সুন্দর পৃথিবীকে আরো সুন্দর ও মহিমান্বিত করেছে। জীবপদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষের জীবন বাচাঁতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এর ব্যবহারের ফলে কতিপয় মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। বিকিরণজনিত কারণে এ স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে আছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকলাঙ্গ হওয়া, গর্ভের সন্তান নষ্ট হওয়া বা অস্বাভাবিক সন্তান জন্ম গ্রহণ করা, ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়াসহ নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা। কিছু সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পড়ে আবার কিছু সমস্যা আছে এটি প্রকাশিত হয় দীর্ঘ সময় পর।

এক্সরে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ। এই বিকিরণ শরীরে প্রবেশ করলে কোষ ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা থাকে। এতে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হবার সম্ভবনা থাকে। ক্যান্সার হবার সম্ভবনা থাকে। এক্সরে মেশিন অপারেটর এবং বোগীকে তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া এমআরআই, সিটিস্ক্যান, আল্ট্রাসনোগ্রাম, এনজিওগ্রাম ইত্যাদি পরীক্ষায় বিকিরণ নির্গত হয় যা শরীরের প্রবেশ করলে ক্ষতির সম্ভবনা থেকে যায়।

বিকিরণ ব্যবহার করে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। বিকিরণের সাহায্যে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করা হলেও বিকিরণের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী কোষ নষ্ট হবার আশংকা থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে বিকিরণের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করা খুবই প্রয়োজন। পরমানু চিকিৎসায় আইসোটোপ ব্যপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আইসোটোপের রাসায়নিক বিক্রিয়া শরীরের

কোষের ক্ষতি করে। এছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রায় বিকিরণ ও আইসোটোপ ব্যবহার করা প্রয়োজন। ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পর্যাপ্ত প্রযুক্তি জ্ঞান না থাকলে মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং আইসোটোপ ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টির আশংকা তৈরি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিকিৎসক, মেডিক্যাল সহকারী, ল্যাব সহকারী এবং সর্বোপরি রোগীরও যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি, রেডিও আইসোটোপ এবং বিকিরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ম নীতি অনুসরণ করা চিকিৎসক, মেডিক্যাল সহকারী, ল্যাব সহকারীগণের অপরিহার্য। এ সকল ক্ষেত্রে রোগীর করণীয় সম্পর্কে রোগীকে পরামর্শ দেওয়া চিকিৎসকের দায়িত্ব।

সার-সংক্ষেপঃ

বিকিরণ ব্যবহার করে রোগ নিরাময়ের একটি উদ্যোগ হচ্ছে রেডিওথেরাপি। এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ যেমন- ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক প্রকৃতি, রক্তের কিছু ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। আইসোটোপগুলো হলো একটি নির্দিষ্ট মৌলের রূপভেদ। বিভিন্ন ভরসংখ্যা বিশিষ্ট একই মৌলের পরমাণুকে ঐ মৌলের আইসোটোপ বলে। চিকিৎসাক্ষেত্রে 'পরমাণু চিকিৎসায়' তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রধানত রোগ নির্ণয় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে বিকিরণ ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা প্রয়োজন।

পাঠত্তোর মূল্যায়নঃ ১৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কার্বনের তিনটি আইসোটোপ ভর সংখ্যা-
   ক. ১০,১১,১২
   খ. ১১,১২,১৩
   গ. ১২,১৩,১৪
   ঘ. ১৩,১৪,১৫

২. চিকিৎসা কজে ব্যবহারকৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে-
   i. রোগীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
   ii. রোগীকে পর্যাপ্ত নিদের্শনা ও সহযোগিতা করা প্রয়োজন।
   iii. রোগ নির্ণয় কেন্দ্র সমূহে নিরাপদ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

পাঠ ১৫.৫ : বাংলাদেশে জীবপদার্থবিজ্ঞান (Bio-physics in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

১. বাংলাদেশে জীবপদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।
২. বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে জীবপদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণার বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে বাংলাদেশে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির বর্ণনা দিতে পারবেন।
৪. সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনামূলক প্রবন্ধ রচনা করতে পারবেন।
৫. রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশংসা করে প্রবন্ধ রচনা ও পোস্টার অংকন করতে পারবেন।

১৫.৫.১ বাংলাদেশে জীবপদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

ষাঠের দশকের শুরুতে বাংলাদেশে বাংলাদেশ জীবপদার্থবিজ্ঞান এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রধানত নিউক্লিয়ার মেডিসিনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে জীবপদার্থবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। এ সময় বাংলাদেশ আণবিক শক্তি গবেষনা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ৩টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইউনিট খোলা হয়। কলেজগুলো হচ্ছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ এবং রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ। সীমিত আকারের এ কার্যক্রমে প্রধাণত গলার গলগন্ড ও থাইরয়েডের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জীবপদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘঠে। সবগুলো সরকারি মেডিক্যাল কলেজে স্থাপিত হয়েছে নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার। বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে জীবপাদার্থবিজ্ঞান, মেডিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞানের পৃথক কোর্স চালু আছে।

১৫.৫.২ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে জীবপদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণা

বাংলাদেশে আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জীবপদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় অগ্রগামী ভুমিকা পালন করে। পূর্ববর্তী আলোচনায় বলা হয়েছে ষাটের দশকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত ইনষ্টিটিউট অব ফুড এন্ড রেডিয়শন বায়োলজী, টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োম্যাটেরিয়াল রিসার্চ ইউনিট এবং হেলথ ফিজিক্স শাখা জীবপদার্থবিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে জীবপাদার্থবিজ্ঞান, মেডিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি শ্রেণিতে কোর্স চালু আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ফার্মাসি, বায়োকেমিষ্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি ডিসিপ্লিনে জীবপাদার্থবিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জীবপাদার্থবিজ্ঞান এবং শাখাসমূহের ওপর এমফিল, পিইচডি এবং উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম চালু আছে।

১৫.৫.৩ বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে বাংলাদেশে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি

চিকিৎসাক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানের নানা সূত্র, নীতি, তত্ত্ব ইত্যাদি ব্যবহার করে নানা প্রকার ইনস্ট্রুম্যান্ট আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করে নানাবিধ রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে ব্যবহারকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ বাংলাদেশের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতাল এবং বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পাওয়া যায়। রোগ নির্ণয়ে এক্স-রে মেশিন, আল্টাসনোগ্রাফি মেশিন এখন বাংলাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পাওয়া যায়। শরীরের রোগাক্রান্ত অংশের চিত্র এক্সরে ফিল্মের সাহায্যে সংগ্রহ করা যায় এবং পর্যালোচনা করে চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে সক্ষম হন। আল্টাসনোগ্রাফি মেশিনে শব্দের প্রতিফলনের ধারণার উপর ভিত্তি করে তেরি হয়েছে । উচ্চ কম্পাংকের শব্দ তরঙ্গকে শরীরের রোগাক্রান্ত অংশে প্রেরণ করলে প্রতিফলিত শব্দ তরঙ্গ মনিটরে দেখা যায়। সিটিস্ক্যান, এমআরআই বা ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (MRI) যন্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের রোগাক্রান্ত অংশের প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়।

নিউক্লিয় চৌম্বক অনুনাদের নীতির উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র কাজ করে। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত প্রতিবিম্ব পর্যালোচনা করে চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করে। ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইটিটি এবং এসজিওগ্রাম হচ্ছে হৃদযন্ত্রে ত্রুটি নির্ণয়ের পরীক্ষা। এই যন্ত্রপতিসমূহ বাংলাদেশের সকল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বিভিন্ন ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসিজি মেশিনের মাধ্যমে হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন অংশে তড়িৎ সংকেত প্রেরণ করলে এর প্রতিফলিত সংকেতের লেখচিত্র পাওয়া যায়। লেখচিত্র পর্যালোচনা করে হৃদযন্ত্রের সুস্থতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শব্দের প্রতিধ্বনির ধারণা ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে ইকোকার্ডিওগ্রাম। এর সাহায্যে হৃদযন্ত্রের পরীক্ষা ইসিজির চেয়েও সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে করা যায়। এছাড়াও মানবদেহে তাপমাত্রা পরিমাপে থার্মোমিটার ব্যবহার খুবই জনপ্রিয়। নিউক্লিয়ার মেডিসিনের চিকিৎসায় আইসোটোপের ব্যবহার মানব কল্যাণে পদার্থবিজ্ঞানের এক মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহে নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়।

দেখা যাচ্ছে যে, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করে সৃষ্ট যন্ত্রপাতি এক্সরে মেশিন,ইসিজি মেশিন, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইটিটি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, এন্ডোস্কোপি, রেডিওথেরাপি, আইসোটোপ ইত্যাদি চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। বাংলাদেশে এই সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপকভাবে হয়ে আসছে। এই সকল আধুনিক মেশিনের সুবিধা বাংলাদেশের জনগণ ভোগ করে আসছে। বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজসমূহ, বিভিন্ন রোগ নির্ণয় সেন্টার এবং চিকিৎসকের চেম্বারে এই সকল যন্ত্রের সুবিধা এখন পাওয়া যায়।

১৫.৫.৪ সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা

প্রতিটি মানুষই আমৃত্যু সুস্থ ও নিরোগ জীবন প্রত্যাশা করেন। প্রতিটি মানুষই দীর্ঘ নিরোগ জীবনযাপন করতে চান। কিন্তু সুস্থ ও নিরোগ জীবন পেতে হলে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করা প্রয়োজন। সুস্থভাবে বেঁচে ধাকার জন্য প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেষ্ঠ উপায়। তথাপিও মানুষ অসুস্থ হয়, রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সঠিক চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়। সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগ নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোগ নির্ণয় নির্ভুল না হলে রোগ নিরাময় সূদুরপরাহত হয়। রোগী ও তার পরিবারের ভোগান্তি দীর্ঘ হয়। ব্যক্তি ও পরিবার আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে। দ্রুত রোগ নিরাময়ের জন্য শুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয়ের দায়িত্ব চিকিৎসকের। চিকিৎসকের উচিত পর্যাপ্ত সময় ধরে সমস্যা নিয়ে রোগীর সাথে কথা বলা এবং প্রয়োজনে সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য টেস্ট দেওয়া। ডাক্তারের উচিত অপ্রয়োজনীয় টেস্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। রোগীর প্রতি ডাক্তারের সহনাভূতিপূর্ণ মানবিক আচরণ প্রদর্শন করা প্রয়োজন। ডাক্তারের মানবিক আচরণ রোগমুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। এক্ষেত্রে রোগী এবং রোগীর অভিভাবকগণেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। রোগের লক্ষণ বিবেচনায় সঠিক ডাক্তার নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে নির্ভরযোগ্য ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে টেস্ট করানো উচিত। দালালের মাধ্যমে ডাক্তার বা হাসপাতাল নির্বাচন করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের শিক্ষিত দায়িত্বশীল আত্মীয় স্বজন, বন্ধু কিংবা প্রতিবেশির পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

১৫.৫.৫ রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশংসা

বিজ্ঞান রোগ জরাকে জয় করেছে। মৃত্যুপথযাত্রীকে জীবন দিয়ে প্রদান করেছে হাসি ও আনন্দ। রোগ মুক্তির একমাত্র ভরসা হচ্ছে সঠিক রোগ নির্ণয় এবং সে অনুসারে ঔষধ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা। পদার্থবিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তত্ত্ব, সূত্র ও নীতির ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ঔষধ এবং উদ্ভাবিত হয়েছে নানা ধরণের অত্যাধূনিক যন্ত্রপাতি। এগুলো আমাদের রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পিছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের প্রচুর শ্রম, কেটেছে বিজ্ঞানীদের বহু বিনিদ্র রজনী। মানব কল্যাণে ও আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন বহু বিজ্ঞানী। পরিহার করেছেন নিজেদের আরাম আয়েশ। অনেকে শিকার হয়েছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্যাতনের। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার পথ থেকে ফিরে আসেননি। আমাদের উচিত বিজ্ঞানীদের যথাযথ প্রশংসা করা এবং তাদের অবদানকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রাখা। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উদযাপন করা উচিত। বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে সমাজ সচেতনতা তৈরি করা আমাদের দায়িত্ব।

সার-সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশে বাংলাদেশ জীবপদার্থবিজ্ঞানের কার্যক্রম শুরু হয় ষাঠের দশকের শুরুতে । প্রধানত নিউক্লিয়ার মেডিসিনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে এই যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সবগুলো সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নিউক্লিয়ার মেডিসিন এবং রেডিওথেরাপি চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হচ্ছে। আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে জীবপাদার্থবিজ্ঞান, মেডিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি শ্রেণিতে কোর্স চালু আছে এবং এমফিল, পিইচডিসহ উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম চালু আছে। বাংলাদেশের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতাল এবং বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে রোগ নির্ণয় এবং রোগ নিরাময়ে জীবপদার্থবিজ্ঞান ভিত্তিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

পাঠত্তোর মূল্যায়নঃ ১৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি জীবপদার্থবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে?

ক. মৃত্তিকাবিজ্ঞান ইষ্টিটিউট
খ. বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
গ. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইষ্টিটিউট
ঘ. টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োম্যাটেরিয়াল রিচার্স ইউনিট

২. সঠিক রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন-

i. রোগীর সচেতনতা
ii. রোগীর প্রতি চিকিৎসকের মানবিক আচরণ
iii. চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সকলের সমাজের প্রতি আনুগত্য ও জবাবদিহিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
গ. ii ও iii
খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-১৫

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. X-ray ফিল্মে হাড়ের ছবি স্পষ্ট দেখা যাওয়ার কারণ-

ক. হাড় X-ray দ্বারা অভেদ্য
খ. মাংসপেশি X-ray দ্বারা অভেদ্য
গ. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বেশি
ঘ. উঁচু ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন

২. সূক্ষ্ম রক্তনালিকার ব্লকেজ পরীক্ষা করার প্রযুক্তির নাম হলো-

ক. এনজিওগ্রাম
খ. এনজিওপ্লাস্টি
গ. ইটিটি
ঘ. ইসিজি

৩. হৃদ স্পন্দনের হার ও ছন্দময়তা পরিমাপ করা হয় কী উপায়ে?

ক. তড়িৎ সংকেত সনাক্ত করে
খ. X-ray এর মাধ্যমে
গ. নিউক্লীয় চৌম্বক অনুনাদের মাধ্যমে
ঘ. শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে

৪. উচ্চ কম্পাংকের শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় নিচের কোন যন্ত্রে?

ক. এক্সরে ও সিটিস্ক্যান
খ. ইসিজি ও এনজিওগ্রাফ
গ. আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও ইকোকার্ডিওগ্রাফি
ঘ. এন্ডোস্কপি ও এমআরআই

৫. গামারশ্মির ব্যবহার করা হয় কোন যন্ত্রে?

ক. এন্ডোস্কপি
খ. ইকোকার্ডিওগ্রাফি
গ. আল্ট্রাসনোগ্রাফি
ঘ. ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহিমের চাচী মা হতে চলেছেন। স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে তিনি এক্সরে করান। কিছুদিন পর বিনুর চাচী অনুভব করেন যে গর্ভের সন্তানটির হয়তো বা কোনো সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় ডাক্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলে তিনি জেলা শহরের অভিজ্ঞ গাইনী বিশেষজ্ঞের কাছে যান। গাইনী বিশেষজ্ঞ কোনো এক মাসে ভ্রুণের সঠিক অবস্থান ও আকার জানার জন্য তাকে আলট্রাসনোগ্রাম করার পরামর্শ দেন। আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টে দেখা যায় যে তার সন্তানের দুই হাতের বিকৃতি ঘটেছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বললেন এই শারীরিক অবস্থায় তার এক্সরে করা ঠিক হয়নি।

ক. এমআরআই এর পূর্ণরূপ কী?
খ. আইসোটোপগুলো একটি নির্দিষ্ট মৌলের রুপভেদ কেন?
গ. এক্সরের সাহায্যে কীভাবে রহিমের চাচীর গর্ভের সন্তানের ছবি পাওয়া গেছে ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. বিনুর চাচীর সন্তানের এহেন অবস্থার কারণ সম্পর্কে অপনার মতামত দিন।

বহু নির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরমালাঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.১	১। (খ)	২। (খ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.২	১। (ক)	২। (গ)	৩। (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.৩	১। (ক)	২। (ক)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.৪	১। (খ)	২। (গ)	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.৫	১। (ঘ)	২। (ঘ)	

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ১৫

১। (ঘ) ২। (খ) ৩। (গ) ৪। (ঘ) ৫। (ক)